# রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী মেধসানন্দ

## বাঙালিদের বৈশিষ্ট্য

আমার ব্যক্তিগত জীবনের একটি ঘটনা এখানে স্মরণ করি। প্রায় চল্লিশ বছর আগে, তখনও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দিইনি, কন্যাকুমারীতে 'বিবেকানন্দ কেন্দ্রে' বেশ কিছুকাল ছিলাম। তখন সেই কেন্দ্রের অনেক কর্মী ও সেবক—যাঁদের অধিকাংশই কেরালার অধিবাসী—তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। আমি বাঙালি জেনে, তাঁরা বাঙালিদের সম্বন্ধে একটি মন্তব্য প্রায়ই আমার কাছে করতেন। বেশ কৌতুককর সেই মন্তব্যটির মধ্যে একটি গভীর পর্যবেক্ষণও ছিল। তাঁরা বলতেন : একজন literate ব্যক্তির যেমন তিনটি R-এর বৈশিষ্ট্য থাকে অর্থাৎ তিনি অল্পবিস্তর Reading, Writing, Arithmetic জানেন তেমনি বাঙালিদেরও তিনটি R-এর বৈশিষ্ট্য আছে : অর্থাৎ বাঙালিদের প্রিয় তিনটি বিষয়ের আদ্যক্ষর 'র' তথা 'R' : রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ আর রসগোল্লা। বাঙালি চরিত্রের এ এক সার্থক পর্যবেক্ষণ।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আধ্যাত্মিকতা। শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের একটিই বৈশিষ্ট্য, তা আধ্যাত্মিকতা। বর্তমান ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ পুরুষের আবির্ভাবের স্থান, কাল ও ভাবের নৈকট্য সত্ত্বেও যথার্থ যোগাযোগ কতখানি হয়েছিল সে-ব্যাপারে অনেকের কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক।

## প্রথম দর্শন

সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি না হয়েও কলকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরের দেবায়তনে শ্রীরামকৃষ্ণের নীরব উপস্থিতির কথা তাঁর ভক্ত, শিষ্য ও অনুরাগিবৃন্দের অনেকেই যেভাবে জেনেছিলেন অর্থাৎ প্রখ্যাত ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের লেখনী মারফত, রবীন্দ্রনাথও সেইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা জেনেছিলেন বলে ধরে নেওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট নেতাদের এবং তদানীন্তন কলকাতার 'এলিট' সমাজের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতা ছিল। ব্রাহ্মসমাজের উৎসব-অনুষ্ঠানে তিনি প্রায়ই সাদরে আমন্ত্রিত হতেন এবং ধর্ম আলোচনা করতেন, তাও রবীন্দ্রনাথের জানা ছিল। কলকাতার নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজের এমন একটি উপাসনাসভায় ১৮৮৩ সালের ২ মে রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন—সেটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে শ্রীম উল্লেখ করেছেন। ৫ মে ১৮৮৩-র The Statesman-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী ওইদিন সমবেতকণ্ঠে যে-ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয় তা পরিচালনা করেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। তখন তাঁর বয়স বাইশ। রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে ওইদিনের কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন : ''পরমহংসদেবকে একদিন দশমিনিটের জন্য দূর থেকে দেখেছি।''[১] বহুকাল

পরে লেখা এই চিঠিতে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকালের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে তাঁর হয়তো বিস্মরণ হয়ে থাকবে। তিনি যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতও পড়েছিলেন সেকথাও তিনি একটি চিঠিতে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।[২]

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ১৮৬০-এর দশকে মথুরবাবুর সঙ্গে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত বালক—তবে বড় হয়ে সেকথা নিশ্চয়ই পারিবারিকসূত্রে তিনি জেনেছিলেন। এরপর জোড়াসাঁকোর কাছেই সিমলার অধিবাসী সুগায়ক, প্রায় সমবয়সি এবং ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগী নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় সমবেতকণ্ঠে কয়েকটি গান পরিবেশনের সূত্রে। সে-যোগাযোগ পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও নরেন্দ্রনাথের শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসা এবং বিবেকানন্দে রূপান্তর—এসবই রবীন্দ্রনাথ জানতেন। ১৮৮৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর বাংলা তথা ভারত এমনকী পাশ্চাত্যেও তাঁর ক্রমবর্ধমান পরিচিতি ও প্রভাবের বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ অবহিত ছিলেন বলে মনে হয়। প্রখ্যাত ফরাসি মনীষী রোম্যাঁ রোলাঁ্যর লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীও তিনি সাগ্রহে পাঠ করেছিলেন।

## রবীন্দ্ররচনায় শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণকে নানাভাবে জানার ফলে মহামনীষী রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করতেন এবং তাঁর অজস্র রচনা, ভাষণ ও উক্তির মধ্যে তার কোনও প্রতিফলন হয়েছিল কি না। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রখ্যাত জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনকথায়' লিখেছেন, ''(১৯৩৬ সালে) রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের জন্য (রবীন্দ্রনাথ) চার পংক্তির কবিতা ও তার ইংরাজী তর্জমা লিখে পাঠালেন। কবি এ পর্যন্ত (শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে) কখনো কোনও ভাষণ বা উক্তি করেননি; এবার যে করলেন তার পিছনে ছিল অন্যের অনুরোধ।" প্রভাতকুমার আরও লিখেছেন : ''(শ্রীরামকৃষ্ণ) শতবার্ষিকী কমিটির ধর্মসম্মেলনে কবি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি পরমহংসদেবের ধর্মমত বা ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও কথাই বলেননি, কেবল বুঝিয়েছিলেন ধর্মের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ঢোকার কি সর্বনাশা পরিণাম।" প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথকে দীর্ঘকাল ধরে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন, জেনেছেন এবং তারই ভিত্তিতে ওই জীবনী লিখেছেন। তিনি যখন শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ নীরবতা এবং নীরবতাভঙ্গের কারণ বিষয়ে মন্তব্য করেন তখন তা স্বভাবতই গুরুত্ব পাওয়ার যোগ্য।

প্রভাতকুমারের একটি বক্তব্য, শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান হওয়া পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোনও ভাষণ দেননি বা কোনও উক্তি করেননি। এই মন্তব্য কি যথার্থ? প্রথমত রবীন্দ্রনাথের সমস্ত উক্তির কোনও 'রেকর্ড' নেই। যা আছে এবং তাঁর বিভিন্ন রচনা পাঠে আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে প্রভাতকুমারের উপরিউক্ত বক্তব্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম আছে। যথা ১৩১৮ সালে তিনি প্রবাসী পত্রিকায় 'রূপ ও অরূপ' বলে একটি প্রবন্ধ লেখেন যেখানে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নাম না করেই তাঁর প্রসঙ্গ এনেছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে উল্লেখ আছে ১৮৮৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি গড়ের মাঠে প্রদর্শনী দেখানোর জন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গে তিনি ভক্তদের বলছেন, ''আমি গেলে সব দেখতে পাব না! একটা কিছু দেখেই বেহুঁশ হয়ে যাব—আর কিছু দেখা হবে না। চিড়িয়াখানা দেখাতে লয়ে

গিছল। সিংহ দর্শন করেই আমি সমাধিস্থ হয়ে গেলাম! ঈশ্বরীর বাহনকে দেখে ঈশ্বরীর উদ্দীপন হল—তখন আর অন্য জানোয়ার কে দেখে! সিংহ দেখেই ফিরে এলাম!"

### একটি বিতর্কিত মন্তব্য

রবীন্দ্রনাথ 'রূপ ও অরূপ' প্রবন্ধে শিক্ষিত মানুষদের প্রতিমাপূজার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে যে-আলোচনা করেছিলেন তার মধ্যে এক জায়গায় মন্তব্য করলেন : ''...সরস্বতীর যাঁহারা পূজক... জ্ঞানস্বরূপ অনন্তের এই একটিমাত্র রূপকেই তাঁহারা চরম করিয়া দেখিতেছেন—তাঁহাদের ধারণাকে তাঁহাদের ভক্তিকে এই বিশেষ রূপের বন্ধন হইতে তাঁহারা মুক্ত করিতেই পারেন না।

''এই বন্ধন মানুষকে এতদূর পর্যন্ত বন্দী করে যে, শুনা যায় শক্তি-উপাসক কোনো একজন বিখ্যাত ভক্ত মহাত্মা আলিপুর পশুশালায় সিংহকে বিশেষ করিয়া দেখিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন—কেন না 'সিংহ মায়ের বাহন'। শক্তিকে সিংহরূপে কল্পনা করিতে দোষ নাই—কিন্তু সিংহকেই শক্তিরূপে যদি দেখি তবে কল্পনার মহত্ত্বই চলিয়া যায়।... যদি তাহা (কল্পনা) কোন এক জায়গায় আসিয়া বদ্ধ হয় তবে তাহা মিথ্যা, তবে তাহা মানুষের শত্রু।"

এখানে 'শক্তি-উপাসক কোনো একজন ভক্ত মহাত্মা' যে শ্রীরামকৃষ্ণ সে-বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, শ্রীরামকৃষ্ণ যেখানে শক্তিস্বরূপিণী মায়ের বাহনরূপে সিংহকে দেখলেন সে-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'শ্রীরামকৃষ্ণ সিংহকেই শক্তিরূপে দেখেছিলেন' এরকম একটা অযথার্থ ও অসতর্ক মন্তব্য কী করে করলেন এবং তার দ্বারা প্রতিমাপূজার সমালোচনাই বা কী করে করলেন। সমসাময়িক সাহিত্যিক কুমুদবন্ধু সেন যখন এ-প্রসঙ্গটি গিরিশচন্দ্র ঘোষের কাছে উল্লেখ করেছিলেন তখন তীক্ষ্মধী গিরিশচন্দ্র এ-নিয়ে চুলচেরা বিচার করে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের ভ্রান্তি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। আরও মন্তব্য করেছিলেন, ''ব্রাহ্মভক্তরা যাঁকে (অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণকে) একাধারে শাক্ত, বৈষ্ণব ও বৈদান্তিক যোগী বলে নির্দেশ করেছিলেন তাঁকে 'শক্তির উপাসক ভক্ত' বলে উল্লেখ করা রবিবাবুর পক্ষে উদারতার পরিচায়ক হয়নি।" রবীন্দ্রনাথের পক্ষে একমাত্র একথা বলা যায় যে, এ-প্রবন্ধ লেখার সময় তিনি (দেবেন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর) আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম কর্ণধার—হিন্দু উপাসনা ও উপাসকদের ভ্রান্তি দেখানো এবং ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন তখন তাঁর অন্যতম দায়বদ্ধতা ।

১৯২৫ সালে ভাইঝি ইন্দিরাকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, ''মনটা কিভাবে ভিতরে ভিতরে লেখা সম্বন্ধে হরতাল নেবার পরামর্শ করছে। টাকা ছুঁলেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের যে রকম সর্বাঙ্গে আক্ষেপ উপস্থিত হত কলম ছুঁতে গেলেই আমার সেরকম হয়।"

এরপর ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন ইওরোপ ভ্রমণে যান তখন নিজেই আগ্রহী হয়ে সুবিখ্যাত ফরাসি লেখক ও মনীষী রোমাঁ্যা রোলাঁ্যার সঙ্গে দেখা করেন। সেই সময় তিনি নিজেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ তোলেন এবং এ-নিয়ে দুজনের যে-আলোচনা হয় রোলাঁ্যা তাঁর ডায়েরিতে তা লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তী যুগে সে-ডায়েরি প্রকাশিত হয় এবং অধুনা তার বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। এ-প্রসঙ্গ পরে আলোচনা করব। ১৯৩১ সালে রবীন্দ্রনাথ 'মালঞ্চ' উপন্যাস লেখেন যেখানে অন্তত তিনবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উল্লেখ আছে। 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধেও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নাম করেছিলেন। লিখেছিলেন, ''ভারতবর্ষ এখনই যে নিশ্চেষ্ট হইয়া আছে তাহা নহে—রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস,

বিবেকানন্দ, শিবনারায়ণ স্বামী ইঁহারাও অনৈক্যের মধ্যে এককে, ক্ষুদ্রতার মধ্যে ভূমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবনের সাধনাকে ভারতবর্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।" প্রায় এ-সময়েই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জয়নগর ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক ত্রিষ্টুপ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে জানতে চান শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি কেমন দেখেছিলেন। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন—যা পরে উল্লেখ করব।

এরপর ১৯৩৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ধর্মমহাসভায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন ও ভাষণ দেন। কিন্তু অনেকেই অবগত নন যে রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটা বইয়ের ভূমিকাও লিখে দেন। বইটির লেখক স্বামী শ্যামানন্দ, যিনি একসময় রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ছিলেন। বইটির নাম 'শ্রীরামকৃষ্ণ কাব্যলহরী'—বাংলা ভাষায় লেখা প্রায় ৫৭৪ পৃষ্ঠার বইটির ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : ''স্বামী শ্যামানন্দ পদ্যছন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ কাব্যলহরী রচনা করিয়াছেন, ইহার যথার্থ মূল্য সরল ভক্তির। ভক্তেরা ইহা শ্রদ্ধাপূর্বক গ্রহণ করিবেন সন্দেহ নাই।"[৩] এসব থেকে প্রমাণিত হয়, জন্মশতবার্ষিকী ভিন্ন অন্য বেশ কয়েকটি উপলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

### শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রশস্তির স্বতঃস্ফূর্ততা

প্রভাতকুমারের দ্বিতীয় বক্তব্য, উপরোধে পড়েই রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর চার পঙ্‌ক্তির কবিতা রচনা করেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রবীণ কোনও কোনও সন্ন্যাসীর কাছেও আমরা অনুরূপ কথাই শুনেছি। তার বিশদ বিবরণের মধ্যে না গিয়েও এ-ব্যাপারে প্রভাতকুমারের বক্তব্য আমরা সঠিক বলে মেনে নিতে পারি। কিন্তু উপরোধে না পড়ে কি রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কখনও কিছু লেখেননি? ধরা যাক 'মালঞ্চ' উপন্যাসটির কথা। এটি শুরুই হচ্ছে অসুস্থ নায়িকা নীরজা এবং তার ঘরের বর্ণনা দিয়ে—যেখানে বলা হয়েছে দেওয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবি। ভিন্ন একটি জায়গায় অসুস্থ নীরজা তার দেওর রমেনকে বলছে, ''যখন চোখের জলে ভিতরে ভিতরে বুক ভেসে যায় তখন ওই পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু ওঁর বাণী তো হৃদয়ে পৌঁছয় না।" তার একটু পরেই নীরজা ওই ছবির দিকে তাকিয়ে দুহাত জোড় করে বলছে : ''বল দাও ঠাকুর, বল দাও, মুক্তি দাও মতিহীন অধম নারীকে।" এই যে একাধিকবার শ্রীরামকৃষ্ণের সশ্রদ্ধ উল্লেখ তা কি উপরোধে পড়ে লেখা? সে তো স্বতঃস্ফূর্ত রচনা!

প্রভাতকুমার আরও বলেছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মমত বা ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও কথাই বলেননি, কেবল বুঝিয়েছিলেন ধর্মের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ঢোকার কী সর্বনাশা পরিণাম। এ-বক্তব্যও যথার্থ নয়। ওই ভাষণে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন। সে-মন্তব্য কী তা বলার আগে তাঁর ভাষণের পটভূমিকা সম্বন্ধে আমরা একটি বর্ণনা পাঠ করব। সেই বর্ণনাটির যেমন ঐতিহাসিক মূল্য আছে তেমনি তা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক এবং নাটকীয় মুহূর্তে পূর্ণ। বর্ণনাটি দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের প্রয়াত সন্ন্যাসী পূজনীয় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী—যিনি দক্ষ সংগঠক হিসেবে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ এই ত্রয়ীর যথাক্রমে ১৯৩৬, ১৯৫৪ এবং ১৯৬৩ সালে জন্মশতবর্ষ পালন উৎসবের সম্পাদক তথা মুখ্য সংগঠকের গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন। মূল বিবরণটি ছিল ইংরেজিতে। আমরা তার নির্বাচিত অংশ এখানে বাংলা অনুবাদে তুলে ধরছি।[৪] তাঁর স্বমুখে সে-কাহিনিটি শোনা যাক।

''এক বৎসরব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মশতবার্ষিকী

উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল বিশ্বধর্ম সম্মেলন। তা চলে ১৯৩৭ সালের ১ মার্চ থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত। দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তাতে অংশগ্রহণ করেন। এই ধর্মসম্মেলনে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রবীন্দ্রনাথের অংশগ্রহণ কিন্তু সহজে সম্ভব হয়নি।

''সবশুদ্ধ ধর্মসম্মেলনের যে-চোদ্দোটি অধিবেশন হয়, তার মধ্যে অন্তত একটিতে সভাপতিত্ব করার অনুরোধ নিয়ে আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করলাম। সব শুনে তিনি বললেন, 'স্বামীজী, আমার অভিজ্ঞতা হল, আমি কোনও সভায় যখনই বক্তৃতা দিতে গিয়েছি তা সে যেখানেই হোক, শুধু বিশৃঙ্খলা ও হট্টগোল দেখেছি। এমনকী পরস্পরে মারামারি ও রক্তপাতের ঘটনাও বিরল নয়। আপনি কি চান আপনাদের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আমি আর একবার এ-ধরনের ঘটনার মধ্যে গিয়ে পড়ি?' আমি বললাম, 'আমি আপনাকে কথা দিতে পারি যে আমাদের অনুষ্ঠানে ওইরকম কিছু হবে না।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাদের সভা কোথায় হবে?' উত্তর দিলাম, 'কলকাতা টাউন হলে।' (চিৎপুর রোড) তিনি বললেন, 'আমার পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব হবে না, কারণ সেখানে অনেকটা সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হবে। আমি এখন তা পেরে উঠব না।' (রবীন্দ্রনাথের তখন বয়স ছিয়াত্তর, মাঝে মাঝে অসুস্থও হয়ে পড়ছিলেন।) আমি বললাম, 'কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল-এ (কলেজ স্কোয়ারের পূর্বদিকে) যদি হয়? তাহলে আপনাকে আর কষ্ট করে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হবে না। আপনি তাহলে রাজি হবেন তো?'

''রবীন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত তাতে রাজি হলেন। স্থির হল তিনি ধর্মসম্মেলনের ৩ মার্চের অপরাহ্ণের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন। এই সাক্ষাতের কিছুকাল পরে যখন সভার প্রস্তুতি চলছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সভাপতিত্ব করার আরও কিছু বাড়তি শর্ত দিলেন। তিনি জানালেন, যেহেতু তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছে না, তিনি তাঁর বক্তব্য বলার পরই সভা ছেড়ে চলে আসবেন। তাঁর জিজ্ঞাস্য ছিল, তিনি চলে আসার পর কে সেইসময় সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন? ফলে তখন আর একজন প্রখ্যাত ব্যক্তির—যিনি রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন—খোঁজ করার প্রয়োজন দেখা দিল। কারণ সে-ব্যক্তি উপযুক্ত না হলে রবীন্দ্রনাথ সভাপতি হতে রাজি হবেন না।

''এরপর রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে বড়জোর পনেরোশো থেকে ষোলোশো শ্রোতা বসতে পারে। কিন্তু এমন সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে যে কয়েক হাজার লোক হলে ঢুকতে চাইবে। তখন কী করবেন? ঢুকতে না পেরে তারা হট্টগোল শুরু করবে এবং নানারকম গণ্ডগোল পাকাবে। ফলে আপনাদের সভা শেষ পর্যন্ত পণ্ড হয়ে যাবে।'

''তাঁকে আমি এই বলে আশ্বস্ত করলাম, 'দেখবেন, এরকম অবাঞ্ছিত কিছু হবে না। কারণ আমরা হলের বাইরে কলেজ স্কোয়ার পার্কে যে-পাম গাছগুলি আছে তাতে অনেক লাউড স্পিকার লাগিয়ে দিয়েছি। যদি ওই পার্কে পঁচিশ হাজার লোকও জড়ো হয় তাহলেও তারা ধর্মসম্মেলনের সমস্ত বক্তৃতাই ভালভাবে শুনতে পাবে।' একথা শুনে রবীন্দ্রনাথ সন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, 'স্বামীজী, আপনারা দেখছি খুব সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। এখন আমি নিশ্চিন্ত হলুম, সব কিছু নির্বিঘ্নে হয়ে যাবে।'

''ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্থলাভিষিক্ত সভাপতি হিসেবে আমি যাঁকে স্থির করলাম তিনি 'মডার্ন রিভিউ'-এর (এবং 'প্রবাসী' পত্রিকারও) প্রখ্যাত সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। রামানন্দবাবুকে সমস্ত পরিস্থিতি জানিয়ে আমি অনুরোধ করলাম যে রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে তাঁকে সভাপতির

দায়িত্ব পালন করতে হবে। শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তিনি বললেন, 'রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে আমি তাঁর শূন্য আসন পূর্ণ করব। এর থেকে বড় সম্মান আর কী হতে পারে! আমি এ-প্রস্তাবে খুবই খুশি।' এ-সংবাদ জেনে রবীন্দ্রনাথও বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

''৩ মার্চ নির্দিষ্ট সময়ে সভা আরম্ভ হওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথকে মঞ্চে নিয়ে আসার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে হঠাৎ আমার নজরে এল, হলে দুজন দর্শকের মধ্যে মারপিট শুরু হয়ে গেছে—এমনকী একজন চেয়ার তুলছে আর একজনকে মারবে বলে! আমি ছুটে গিয়ে তাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোনওমতে তাদের আলাদা করে দিলাম। তারপর তাদের একজনকে আর একজনের থেকে অনেক দূরে বসিয়ে দিলাম।

''রবীন্দ্রনাথ যখন হলে ঢুকলেন তখন হল সম্পূর্ণ শান্ত ও নিস্তব্ধ। অন্য বক্তারা এবং আমরা সংগঠকরা মঞ্চের উপর চেয়ারে বসলাম। কেবল রবীন্দ্রনাথের জন্য একটি আরাম কেদারার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। বক্তাদের মধ্যে সকলেই ছিলেন বিখ্যাত যেমন সরোজিনী নাইডু, স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ড (প্রখ্যাত ব্রিটিশ রাজপুরুষ, মনস্বী ও যশস্বী লেখক) প্রমুখ। আমি মাঝে মাঝেই রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে খোঁজ নিচ্ছিলাম তিনি কোনও অসুবিধা বোধ করছেন কি না।

''বলা বাহুল্য প্রধানত যাঁর আকর্ষণে অধিকাংশ দর্শক এই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথ—যাঁর সম্বন্ধে প্রত্যেক ভারতবাসী গর্বিত। রবীন্দ্রনাথ চেয়ারে বসে তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করলেন। অপূর্ব সেই ভাষণটি পাঠ করতে আধ ঘণ্টার মতো সময় লাগল। সুঁচ পড়লেও শোনা যাবে এমন নিস্তব্ধ পরিবেশে দেড় হাজার শ্রোতা নিবিষ্ট চিত্তে সেই বক্তৃতা শুনলেন।

''বক্তৃতার শেষে চলে যাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ চেয়ারেই বসে থাকলেন। এদিকে সভাও চলতে লাগল। আমার কিন্তু ভিতরে ভিতরে খুব অস্বস্তি হতে থাকল এই ভেবে যে, রবীন্দ্রনাথ যদি সভার শেষপর্যন্ত থেকে যান তাহলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত সভাপতি হিসেবে ঠিক করা রামানন্দবাবুকে কী জবাবদিহি করব। তাই আমি মনে মনে প্রার্থনা করতে থাকলাম যে রবীন্দ্রনাথ সভা শেষ হওয়ার অন্তত কয়েক মিনিট আগেও যেন চলে যান। তাহলে খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও রামানন্দবাবুকে সভাপতির আসনে বসানো যাবে।

''কিন্তু শেষপর্যন্ত ঘটনা তা ঘটল না। যখনই আমি রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করি তিনি ক্লান্ত বোধ করছেন কি না, তিনি উত্তর দেন, 'না না স্বামীজী, আমি ভালই বোধ করছি—আমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। আমার সব কিছু খুব ভাল লাগছে।'

''যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের ভাষণের পর আরও তিন ঘণ্টা সভা চলল। সারাক্ষণ তিনি বসে থাকলেন এবং সব বক্তৃতাই শুনলেন। সভার শেষে রবীন্দ্রনাথ চলে যাওয়ার পর রামানন্দবাবুর সঙ্গে আমি কথা বললাম এবং তাঁকে ধর্মসম্মেলনের অন্য একদিনের অধিবেশনের সভাপতি হওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি অনুগ্রহ করে রাজি হওয়ায় আমার এক বড় দুশ্চিন্তা দূর হল।

''সভায় রবীন্দ্রনাথের যোগদানের পরের দিন অর্থাৎ ৪ মার্চ রামানন্দবাবু এবং আমি দুজনেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম খোঁজ নেওয়ার জন্য যে আগের দিনের অতখানি ধকলের পর তাঁর শরীর কেমন আছে। রবীন্দ্রনাথ তখন বললেন, 'আমি ভালই আছি। স্বামীজী, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এত দর্শকের উপস্থিতি সত্ত্বেও এরকম শান্তিপূর্ণ সভার অভিজ্ঞতা আমার জীবনে প্রথম। আমি বাস্তবিকই এই সভা বিশেষভাবে উপভোগ করেছি। রামকৃষ্ণ মিশনের সংগঠন ক্ষমতায় আমি অভিভূত। আপনারা সত্যিই একটা

বড় কাজ করেছেন।' আমি অবশ্য বিশ্বাস করি রামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সাফল্য আমাদের প্রচেষ্টায় হয়নি—রামকৃষ্ণদেবের কৃপাতেই তা সম্ভব হয়েছে।"

এখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তার উদ্ধৃতি দেব :

"Friends,

When I was asked to address this distinguished gathering, I was naturally reluctant, for I do not know if I can be called religious in the current sense of the term, not claiming as my possession any particular idea of God, authorized by some time-honoured institution. If, in spite of all this, I have accepted this honour, it is only out of respect to the memory of the great saint with whose Centenary the present Parliament is associated. I venerate Paramahamsa Deva because he, in an arid age of religious nihilism, proved the truth of our spiritual heritage by realizing it, because the largeness of his spirit could comprehend seemingly antagonistic modes of sadhana, and because the simplicity of his soul shames for all time the pomp and pedantry of pontiffs and pundits."[৫]

দেখা যাচ্ছে, প্রভাতকুমার যে বলেছিলেন এই ভাষণে রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ করেননি, তা যথার্থ নয়। রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এবং সে-শ্রদ্ধার কারণও উল্লেখ করেছেন যার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব জড়িত।

### রবীন্দ্রনাথের আপেক্ষিক নীরবতা

বিভিন্ন প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসামূলক কিছু মন্তব্য থাকলেও তিনি প্রধানত তাঁর সম্বন্ধে যে নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন তা বেশ বোঝা যায়। তুলনামূলকভাবে সমকালের কোনও কোনও বিখ্যাত ব্যক্তি যেমন বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, গান্ধীজী, এমনকী নিবেদিতার সম্বন্ধেও তাঁর মন্তব্য অনেক ব্যাপক। তবে ওই নীরবতার কারণ আর যাই হোক, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতা নয়। কারণ আমরা আগেই দেখে এসেছি যে রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেওছেন এবং তাঁর সম্বন্ধে নানা সূত্রে জেনেওছেন। বাইরে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে নিতান্ত সাধারণ মনে হলেও তাঁর মধ্যে এমন একটা অসাধারণত্ব ছিল যে তাঁকে একবার দেখলেও, বিশেষত একজন অনুভবী পুরুষের পক্ষে, তাঁকে সারাজীবন ভুলে থাকা কঠিন। তাহলে রবীন্দ্রনাথের নীরবতার কারণ কী? তার দুটি কারণ থাকতে পারে।

প্রথম কারণ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, কালীপূজা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ রোল্যাঁর কাছে যে-মন্তব্য করেছিলেন আমরা রোম্যাঁ রোল্যাঁর ডায়েরি থেকে তার উদ্ধৃতি দেব। প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল যে রোল্যাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী লিখে তাঁদের পাশ্চাত্যজগতে সুপরিচিত করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথও সে-বই পড়েছিলেন। এখন তিনিই আগ্রহী হয়ে রোল্যাঁর কাছে ওই বিষয়টি উত্থাপন করলেন। রোল্যাঁ লিখেছেন, (প্রাসঙ্গিক দু-একটি বিষয় আলোচনার পরই) ''রবীন্দ্রনাথ সরাসরি হিন্দু বহুদেববাদের বিশেষ করে কালীউপাসনার বিরুদ্ধে সোজাসুজি আক্রমণে চলে এলেন। বাল্যকালে কলকাতার কালীমন্দিরে বলি সম্বন্ধে যে-ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়েছিল, ক্রোধ ও বিতৃষ্ণা সহকারে তিনি তা বর্ণনা করে মন্তব্য করলেন, সারাজীবনে সে-দৃশ্য তিনি কখনও

ভোলেননি। তিনি আরও যোগ করলেন—কালীর উপাসনা যারা টিকিয়ে রাখে তারা সুস্থ, সঠিক ও সৎ মানসিকতার মানুষ হতে পারে না। এমনকী কালীপূজাকে অধিবিদ্যা বা প্রতীকের স্তরে নিয়ে যাওয়াকেও তিনি মেনে নিতে পারেন না।"

রোল্যাঁ মন্তব্য করেছেন, স্পষ্টই বোঝা গেল যে রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে এই মুহূর্তে আছেন বিবেকানন্দ। বর্তমান লেখকের মনে হয় শুধু বিবেকানন্দ নন, শ্রীরামকৃষ্ণও ছিলেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া কালীপূজা এবং তার অঙ্গ হিসেবে বলিদানের বিরুদ্ধে শুধু নয়, এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে—যার সাহিত্যিক প্রকাশ তাঁর 'বিসর্জন' নাটকে—যেখানে হাসি প্রশ্ন রাখছে ''এত রক্ত কেন''। বিধিবাদীয় ভক্তির অঙ্গ হিসেবে প্রতিমার সম্মুখে বলির বিধান থাকলেও তার মধ্যে যে একটা নিষ্ঠুরতা আছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। যার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ''আমি বলিদান দেখতে পারি না।'' বলির বিরুদ্ধে যেকোনও কোমলচিত্ত মানুষের বিশেষ করে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে লালিত রবীন্দ্রনাথের তীব্র প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সে-প্রতিক্রিয়া যদি এমন পর্যায়ে চলে যায়, যেখানে তা যুক্তিবোধ তথা স্বচ্ছদৃষ্টিকে আবৃত করে ফেলে তাহলে সে-ধরনের প্রতিক্রিয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

প্রথমত পশুবলি না দিয়ে তার বিকল্প অন্য বলি দিলেও কালীপূজা সিদ্ধ হয়—একথা শাস্ত্রসম্মত এবং বহুল প্রচলিতও। উপরন্তু সাধারণ ভক্তের কালীপূজা আর শ্রীরামকৃষ্ণের কালীসাধনা কি এক? শ্রীরামকৃষ্ণ যদি কালীকে কেবল মৃন্ময়ী বলে মনে করতেন, চিন্ময়ীরূপে না দেখে হিংসা ও রক্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে মনে করতেন এবং কেবলমাত্র বৌদ্ধিক স্তরে নয়, অনুভূতির চরম স্তরে আরূঢ় হয়ে তন্ত্রের কালী ও উপনিষদের সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে এক ও অভিন্ন বলে ধারণা না করতেন তাহলে কেশবচন্দ্রের মতো নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী ব্রাহ্মনেতাদের এবং স্বামী বিবেকানন্দের মতো তেজস্বী, মননশীল, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের কীভাবে আকর্ষণ করলেন, কীভাবেই বা তাঁদের গভীরভাবে প্রভাবিত করলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষাকৃত নীরবতার দ্বিতীয় কারণ মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন নিবৃত্তিমার্গের আদর্শে বিশ্বাসী। শুধু তাই নয়, তিনি তার মূর্তবিগ্রহ ছিলেন। ভক্ত, শিষ্য ও অন্যান্যদের তিনি কম-বেশি ত্যাগের উপদেশই দিতেন। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। কিন্তু তিনি যেহেতু কবি হিসেবেও বটে সাধক হিসেবেও বটে, সংসারের সহস্র বন্ধনের মধ্যে আনন্দ ও মুক্তিলাভের প্রয়াসী, তাই নিবৃত্তিমার্গের আদর্শ ও উপদেশ তাঁর ভাললাগার কথা নয়, তাতে তাঁর স্বচ্ছন্দ বোধ না করারই কথা। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্যক্তিত্বের কোনও কোনও দিককে তাঁর বিশেষভাবে প্রশংসনীয় মনে হলেও অন্য কিছু কিছু দিককে মেনে নিতে তিনি এক প্রবল মানসিক বাধা অনুভব করেছেন। উপরন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দ আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক গুরুরূপে শ্রীরামকৃষ্ণকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁদের একাংশ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশাতেই তাঁকে ঈশ্বরের অবতাররূপে পূজা করতেন। গুরুবাদ ও অবতারবাদের বিরোধী ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ তা জানতেন এবং তাকে মেনে নিতে পারেননি, যেমন পারেননি শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ অনেক ব্রাহ্মনেতা। শ্রীরামকৃষ্ণকে যথার্থভাবে গ্রহণ করার পক্ষে এইগুলি ছিল রবীন্দ্রনাথের মূল প্রতিবন্ধক, যার পরিণামে অনেকসময়েই শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নীরবতা অবলম্বন করেছেন।

সবদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব ছিল মিশ্র। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অনুকূল, কোনও

কোনও ক্ষেত্রে প্রতিকূল। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মন্তব্যের যে-উদ্ধৃতি পূর্বে দিয়েছি তার থেকে বোঝা যাবে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশংসা করেছেন, তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন—যেমন তাঁর চার পঙ্‌ক্তির শ্রীরামকৃষ্ণ প্রশস্তি : 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা/ ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা/ তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে/ দেশ-বিদেশের প্রণাম আনিল টানি/ সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি' কিংবা ধর্মসম্মেলনে তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। এ-সমস্তই তাঁর 'উপরোধে পড়ে' বলা বা লেখা, তিনি অন্তর থেকে তা বিশ্বাস করতেন না—এসব মৌখিক, আন্তরিক নয়—রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে একথা বলা শুধু ভ্রান্তিমূলকই নয়, অবমাননাকর। উপরন্তু কেবলমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত-শিষ্যরা নয়, তদানীন্তন বাঙালিসমাজের একাংশও তাঁকে যে দেবতার আসনে বসিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ঊর্ধ্বে উঠে সেই ঘটনাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন 'মালঞ্চ' উপন্যাসে। এখানে তাঁর সত্যের প্রতি দায়বদ্ধতা তথা মহত্ত্বের পরিচয় পাই।

### রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ

জীবনের প্রায় শেষপ্রান্তে, যখন রবীন্দ্রনাথের বয়স সত্তর, তিনি ত্রিষ্টুপ মুখোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর মনোভাব অনেকটা খোলাখুলিভাবে জানান, যা কিছুটা স্বীকারোক্তি- মূলক : ''সমস্ত দেশের লোকের চিত্তে তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) প্রবল ভক্তির সঞ্চার করেছেন তারই মধ্যে তাঁর মহত্ত্ব সপ্রমাণ ও তাঁর কীর্তি চির প্রতিষ্ঠিত হয়ে রইল। আমি যদি তাঁকে সম্পূর্ণভাবে চেনবার সুযোগ না পেয়ে থাকি, সেটা আমারই পক্ষে আক্ষেপের কারণ হয়েছে।'' শ্রীরামকৃষ্ণকে চেনবার সুযোগ না পাওয়ার কথা এই যে তিনি বললেন, তার যথার্থ কারণ আমরা আগেই ব্যাখ্যা করেছি।

### চেতনার কেন্দ্রে ঈশ্বর

আমাদের সিদ্ধান্ত যে, মতে ও পথে কিছু কিছু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথের দুজনেরই চেতনার কেন্দ্রে ঈশ্বর অধিষ্ঠিত। দুজনেরই জীবন ছিল অধ্যাত্মভিত্তিক এবং সমন্বয়মুখী—যদিও শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে তা ছিল আরও গভীর, আরও ব্যাপক। তাই রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সাধনার ও সমন্বয় সাধনার পূর্ণরূপ কি আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে দেখি না? দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করে যে-উপলব্ধিবান পুরুষ অদ্বৈতরসসমুদ্রে নিবিড়ানন্দে নিশ্চল স্থিতিলাভ করেছেন, যাঁকে হৃদয়ের সমুচ্চ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন কবি তাঁর একাধিক রচনায়, সেই পুরুষটিকে কি আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে মূর্ত দেখি না? উপরন্তু ঈশ্বরের প্রতি শান্তভাবে, কখনও সখ্যভাবে কখনও মধুরভাবে ভালবাসার কথা শুধু যে রবীন্দ্রনাথের গানে, কবিতায়, প্রবন্ধে পাই তাই নয়, ঈশ্বরকে দাস্যভাবে, বাৎসল্যভাবে ভালবাসার মূর্তরূপও তো আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে দেখি।

রবীন্দ্রনাথ যে-সমন্বয়ের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, যার মূল কথা ছিল 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে', যে-সমন্বয়ের বাণী তিনি দেশ-বিদেশে প্রচার করেছেন এবং সর্বপ্রকার সংকীর্ণতার নিন্দা করেছেন, 'যত মত তত পথ' মন্ত্রের উদ্গাতা শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সে-সমন্বয়ের আদর্শ ইতিমধ্যেই চরমরূপ পরিগ্রহ করেছিল, আর তাঁর বার্তাবহ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

### ঈশ্বরপ্রেমের ভাষা

ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার মূলকথা হল ভগবানলাভ জীবনের উদ্দেশ্য এবং ভগবানলাভের প্রধান উপায় ঈশ্বরকে

ভালবেসে তাঁর আরাধনা করা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা ও গানের মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে বাঙালি দেশপ্রেমিকদের দেশপ্রেমের ভাষা জুগিয়েছেন, প্রকৃতিপ্রেমিকদের প্রকৃতিপ্রেমের এবং সাধারণ প্রেমিক-প্রেমিকাদের মানবীয় প্রেমের ভাষা যেমন জুগিয়েছেন, তেমনি ভক্তদের ঈশ্বরপ্রেমের ভাষাও জুগিয়েছেন। বাংলা ভক্তিগীতির রচয়িতা হিসেবে কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ, রাজা রামকৃষ্ণ, দাশরথি রায় প্রমুখ তো ছিলেনই, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রহ্মসংগীত রচয়িতারা সেই গানে এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছিলেন—যা পরিপূর্ণতা পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের গানে। তাঁর গানে যেমন ভাবের গভীরতা আছে তেমনি এমন এক শান্ত মাধুর্য আছে যা সহজেই মনকে টানে। তাই ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার চর্চায় রবীন্দ্রনাথের পূজার গান ও কবিতা বহু ভক্তের একান্ত প্রিয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই শ্রীম কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্দেশ করে বলেছেন, 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'। স্বামী বিবেকানন্দ বেশ কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত ভক্তিগীতি হিসেবে শ্রীরামকৃষ্ণকে শুনিয়েছেনও, যাদের অন্যতম দুটি : 'সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে' এবং 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বেশ কয়েকজন বরেণ্য সন্ন্যাসী রবীন্দ্রনাথের পূজার গান খুব পছন্দ করতেন, গাইতেনও। মিশন প্রকাশিত ভজনসংগীতের একটি সংকলন গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের তিরিশেরও বেশি গান আছে।

তাই একথা সত্যি যে বাঙালিদের ভালবাসায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথের যুগ্ম অবস্থান এবং সে-ভালবাসা পরস্পরের পরিপূরক, যদিও ব্যক্তিবিশেষে তার তারতম্য আছে। বহুকাল ধরে রবীন্দ্রনাথের চর্চা নানাভাবে হচ্ছেই কিন্তু যে-অধ্যাত্মভিত্তিক জীবনদর্শন তাঁর জীবন ও সৃষ্টির কেন্দ্রে অবস্থিত সে-সম্বন্ধে চর্চা লক্ষণীয়ভাবে কম। অথচ রবীন্দ্রনাথ বারবার তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

### একবার অন্তরের দিকে চোখ ফেরাও

গতানুগতিকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে আমরা যেভাবে জীবনযাপন করি তার সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, ''আমি সমস্ত জীবন বাইরের দিকেই হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম। দশজনের সঙ্গে মিলছি মিশছি, হাসি গল্প করছি, আর ভাবছি কোনোমতে দিন কেটে যাচ্ছে,—যেন দিনটা কাটানোই হচ্ছে দিনটা পাবার উদ্দেশ্য। যেন দিনের কোনো অর্থ নেই।''[৬]

ইদানীংকালের নাট্যকার বাদল সরকার তাঁর প্রতীকী নাটক 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-এর মাধ্যমে জীবনের এই গতানুগতিকতার কথা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ—''একবার অন্তরের দিকে চোখ ফেরাও—তখনই সমস্ত মানে বুঝতে পারবে।... তোমার এই সুগভীর নির্জনতার মধ্যে তোমার এই অন্তহীন চিদাকাশের মধ্যে তাঁর এই অদ্ভুত বিরাট লীলা—দিনে রাত্রে অবিশ্রাম। এই আশ্চর্য প্রভাতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে একে কেবলই বাইরের দিকে দেখতে গেলে এতে আনন্দ পাবে না, অর্থ পাবে না।''[৭]

রবীন্দ্রনাথের অনুজ্ঞা 'এই ভিতরের দিকে তাকানো' আর 'যাঁর অন্তহীন অদ্ভুত বিরাট লীলা সেই পরমদেবতার দিকে তাকানো' সমার্থক। উপনিষদকে অনুসরণ করে বারবার তিনি তাঁকেই পিতা বলে সম্বোধন করেছেন। লিখছেন : ''এ আমি তোমাদের জোর করেই বলে রাখছি। এতবড়ো বিশ্বে এবং এমন মহৎ মানবজীবনে তাঁকে কোনো জায়গাতেই একটুও স্বীকার করবে না—এ তো কিছুতেই হতে পারবে না।''[৮] ''দিনের আরম্ভে প্রভাতের অরুণোদয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই কথাটা একবার স্বীকার করে যেতেই হবে যে, 'পিতা

নোঽসি'— তুমি পিতা, আছ।... আমি স্বীকার করছি তুমি আছ। একবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেবল এই কথাটি বলে যাবার জন্যে তোমাদের সংসার ফেলে চলে আসতে হবে। কেবল সেইটুকু সময়ে থাক্ তোমাদের কাজকর্ম, থাক্ তোমাদের আমোদপ্রমোদ।"[৯] সেই পরমপিতার উপলব্ধির সাধন কী? রবীন্দ্রনাথ বলছেন, ''প্রতিদিন সকল কর্মের মধ্যে আমাদের সাধনাকে জাগিয়ে রাখতে হবে। এই সাধনাটিকে আমাদের গড়তে হবে।"[১০] শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন সব কাজের মধ্যে ঈশ্বরচিন্তার জাগপ্রদীপ জ্বালিয়ে রাখার কথা বলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ আরও বলছেন, ''শরীরটিকে মনটিকে হৃদয়টিকে সকল দিক দিয়ে ব্রহ্মবিহারের অনুকূল করে তুলতে হবে।... প্রতিদিন অহংকারের দিকে, স্বার্থের দিকে, আমাদের নিঃশেষে মরতে হবে এবং মৈত্রীর দিকে, প্রেমের দিকে, পরমাত্মার দিকে, অপরিমাণরূপে বাঁচতে হবে।"[১১] কিন্তু ভাসাভাসা ভাবে বা ফাঁকি দিয়ে সে-সাধনা তো হওয়ার নয়! অথচ ধর্মচর্চায় ব্রতী হয়ে আমরা অধিকাংশই তো তাই করি। তাই রবীন্দ্রনাথের তীব্র পরিহাস : ''যখন বিদ্যার ধনের বা মানুষের উপাসনা করি... তখন উপাসনা যে কাকে বলে তা বুঝতে বাকি থাকে না। কেবল ঈশ্বরের উপাসনাটাই হচ্ছে উপাসনার মধ্যে সবচেয়ে ফাঁকি।"[১২]

## পূর্ণত্বের সাধনা

রবীন্দ্রনাথের উপরিউক্ত মন্তব্যগুলির ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, তাঁর জীবনদর্শন এবং ভারতের সুপ্রাচীন কালের বৈদিক ঋষি থেকে ইদানীংকালের মনীষীদের জীবনদর্শন মূলত এক। অধ্যাত্মভিত্তিক সেই জীবনদর্শনকে কোনও গুরুত্ব না দিয়ে, তাকে পরিহার করে রবীন্দ্রচর্চা তথা জীবনচর্যা করলে সে-চর্চা যেমন সার্থক হবে না, তেমনি জীবনের মধ্যে এমন একটা শূন্যতা থেকে যাবে যে ধন-জন-যৌবন-খ্যাতি-প্রতিপত্তি কোনও কিছু দিয়েই তাকে ভরাট করা যাবে না। তাই আমাদের জীবনের পাত্র যতদিন না পূর্ণ হয় ততদিন যেন অপূর্ণতার বেদনা (divine discontent) আমরা অন্তরে জাগিয়ে রাখি; আর সেই বেদনা যেন আমাদের উদ্বুদ্ধ করে পূর্ণত্বের সাধনায় :

''যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু,/ এবার এ জীবনে/ তবে তোমায় আমি পাই নি যেন/ সে কথা রয় মনে।/ যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই/ শয়নে স্বপনে।/ এ সংসারের হাটে/ আমার যতই দিবস কাটে,/ আমার যতই দু হাত ভরে উঠে ধনে,/ তবু কিছুই আমি পাই নি/ যেন সে কথা রয় মনে।/ যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই/ শয়নে স্বপনে।"

## তথ্যসূত্র


১। তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্য, *সাধক ও কবি : শ্রীরামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথ,* কোরক সাহিত্যপত্রিকা, শ্রীরামকৃষ্ণ সংখ্যা, শারদ ১৪১৮, পৃঃ ১১৩

২। তদেব, পৃঃ ১১৪

৩। তদেব, পৃঃ ১১৬

৪। দ্রঃ *The Global Vedanta,* Vedanta Society of Western Washington, Seattle, pp. 3-4

৫। পূর্ণ ভাষণটির জন্য দ্রষ্টব্য : *The Religions of the World,* published by the Secretary, The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta, 1938, pp. 124-133

৬। *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (বিশ্বভারতী : কলকাতা, ১৩৯৫), খণ্ড ৭, পৃঃ ৬২৬

৭। তদেব, পৃঃ ৬২৭

৮। তদেব, পৃঃ ৬১৮

৯। তদেব

১০। তদেব, পৃঃ ৬৪৪

১১। তদেব, পৃঃ ৬৪৪, ৬৫১

১২। তদেব, পৃঃ ৬২৮-২৯